সম্প্রদায় (Community)

সম্প্রদায় (Community)কাকে বলে? সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? সম্প্রদায়ের ভিত্তি গুলির ব্যাখ্যা।

সমাজতত্ত্ববিদদের মতে কোন স্বাভাবিক মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। সে তার আসপাসের মানুষজনের সাথে নানান সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। এদের নিয়েই গড়ে ওঠে গোষ্ঠী। মানব সমাজে বহু ও বিভিন্ন গোষ্ঠী লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকে সকল গোষ্ঠীর সদস্য হয় না বা হওয়াও যায় না। তবে যারা তার পাশে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের একটি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিছু সংখ্যক মানুষ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসবাস করতে থাকলে তাদের মধ্যে অভিন্ন চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক বিষয়াদিতে অভিন্নতা, ঐতিহ্যগত অভিন্নতাবোধ, নিজেদের মধ্যে গভীর সংহতিবোধ প্রভৃতি দেখা দেয়। নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে একটি জনগোষ্ঠীর এইভাবে সুসংহত সামাজিক জীবন-যাপন সূত্রে সৃষ্টি হয় সম্প্রদায়ের।

লুন্ডবার্গ(Lundberg) তাঁর Sociology গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সম্প্রদায় হল একটি মানব গোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে এবং একটি সাধারণ আন্তর্নির্ভরতার জীবন-যাপন করে।' ম্যাকাইভার ও পেজ(MacIver & Page) সম্প্রদায় প্রসঙ্গে তার সোসাইটি(Society) গ্রন্থে বলেন, 'ছোট অথবা বড় যে কোন জনসমষ্টির সদস্যরা যখন নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত না হয়ে সংঘবদ্ধ জীবনের মৌল প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, তখন সেই জনসমষ্টিকে সম্প্রদায় বলা হয়।' এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার আরও বলেন, 'মানুষের সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়, যা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভব নয়।' সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কোন ব্যবসায়িক সংগঠন বা ধর্মীয় সংগঠনে থেকে মানুষের জীবনের মৌল প্রয়োজনের যাবতীয় চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে না, তাই এই জাতীয় সংঘ-সমিতিকে সম্প্রদায় বলা যায় না।

অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস (Kingsley Devis)- এর মতানুসারে সমপ্রদায় হল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আঞ্চলিক গোষ্ঠী। সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই সদস্যদের সকল প্রকার উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের যাবতীয় অভাবের পরিতৃপ্তি ঘটে। অধ্যাপক জিসবার্ট(Gisbert) এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সম্প্রদায় এক স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী যা সদস্যদের সমগ্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে মানুষ সম্প্রদায়ের বাইরে না গিয়েও তার জীবনের সকল চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে। যেমন গ্রাম-সম্প্রদায় বা নগর-সম্প্রদায়।

তবে সম্প্রদায় যে সব সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে কোন একটি বৃহৎ সম্প্রদায়কেও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় না। আবার কোন সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নভাবেও থাকতে পারে না। আধুনিক বৃহৎ সম্প্রদায়গুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। প্রাচীনকালে স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে শিল্প সভ্যতার যুগে তা ভাবা বাতুলতা মাত্র। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ঃ

উক্ত সকল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সম্প্রদায়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি। প্রথমতঃ সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে এই সম্পর্ক সাধারণত প্রত্যক্ষ-পরিচয় ভিত্তিক। পরিবারের, গ্রামের অধিবাসীদের, জাতি বা উপজাতির সদস্যদের মধ্যে যে নিবিড় সম্বন্ধ-বন্ধন থাকে তা ব্যক্তিগত পরিচয়-ভিত্তিক। দ্বিতীয়তঃ সম্প্রদায় তার সদস্যদের সকল মৌল প্রয়োজন সাধন করে। শিশু তার পরিবারের মধ্যে, মানুষ তার গ্রাম অথবা শহরের মধ্যে, আদিবাসী মানুষ তার জাতি বা উপজাতির মধ্যে থেকে সকল রকম প্রয়োজন সাধন করতে পারে। সংঘ বা সমিতির মধ্যে থেকে যা সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে যেখানে সম্প্রদায়ের সদস্যরা একত্রে বসবাস করে। চতুর্থতঃ একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাস করার জন্য সম্প্রদায়ের সভ্যদের মধ্যে পাস্পরিক সমন্ধ-বন্ধনের উৎপত্তি হয় যা সম্প্রদায়কে দৃঢ় ও সুসংহত করে। পঞ্চমতঃ স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা অনুসারে সম্প্রদায়ের ব্যাপকতা কম অথবা বেশী হয়। স্বার্থ ক্ষুদ্র হলে ব্যক্তি বৃহৎ নগরে বসবাস করলেও সে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত হয়। আবার স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হলে ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাস করেও ব্যক্তি বৃহৎ সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত হতে পারে।

সম্প্রদায়ের ভিত্তি ঃ(Basis of community)

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ সম্প্রদায়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির কথা বলেন। ১) স্থান বা অঞ্চল (Locality) ২) সম্প্রদায়গত মনোভাব (Community sentiment)। তাঁর মতে, 'The basis of community are locality and community sentiment'।

১) আঞ্চলিক ভিত্তি(locality)ঃ যে কোন সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং এই আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি করে। সম্প্রদায়ের ধারণার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধারণা ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে থাকে অর্থাৎ একটি সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তিবর্গ সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করবে। আর এই বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই একটি সম্প্রদায় ও একটি সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণিত হয়। ধরাযাক্ কোন প্রবাসী জনগোষ্ঠী যদি কোন দেশের বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে তাহলে তারা এক জাতির অর্ন্তভূক্ত হলেও আঞ্চলিক ভিত্তির অভাবের জন্য, তাদের সম্প্রদায় বলা যাবে না। আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের এক অপরিহার্য উপাদান। এমনকি ইতস্তত ভ্রাম্যমান যাযাবর সম্প্রদায়ের, বেদুইন বা জিপসি সম্প্রদায়ের সদস্যরাও একই অঞ্চলে বসবাস করে। প্রতি সময়ে তারা দলবদ্ধভাবে বিশ্বের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে।

অধ্যাপক অগবার্ণ ও নিমকফ (W. F. Ogburn & M. F. Nimkoff) তাঁদের A Handbook of Sociology গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন সম্প্রদায় হল একটি গোষ্ঠী বা সংগৃহীত গোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস এই বৈশিষ্ট্যটাই গোষ্ঠীর সাথে সম্প্রদায়ের পার্থক্য নির্ণয় করে। তাই বলা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সমস্বার্থের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাকে সম্প্রদায় বলা যায় না। কারণ তার মধ্যে আঞ্চলিক অখণ্ডতা নেই।

তবে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে, এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে আঞ্চলিক ভিত্তির গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পেয়েছে। তবে একথা বলা যায় যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আঞ্চলিক ভিত্তিটি বিনষ্ট হয় নি। আসলে সম্প্রদায়ের কলেবর সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে - গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে শহুরে সম্প্রদায়ের যোগাযোগের ফলে গ্রাম-সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি পয়েছে। সম্প্রদায়ের সংহতি রক্ষার জন্য আঞ্চলিক ভিত্তির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আঞ্চলিক ভিত্তি যত বেশী সুনির্দিষ্ট হবে সম্প্রদায়ের সংহতি তত বেশী বৃদ্ধি পাবে।

সম্প্রদায়গত মনোভাব (community sentiment)ঃ সম্প্রদায় হল এক অভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। এই কারণে সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা একতা দেখা যায় বা একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। আবার অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে একটা স্বাতন্ত্রবোধও সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তিবর্গ একই অঞ্চলে বসবাস করে। তাই তাদের মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র বা দৃঢ় ঐক্যবোধ দেখা দেয়। তারই ভিত্তিতে সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিশেষ মনোভাব গড়ে ওঠে। এই মনোভাবকে বলা হয় সম্প্রদায়গত মনোভাব।

বস্তুতঃ একই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি সমচেতনা জাগ্রত হয় তবেই সৃষ্টি হয় সম্প্রদায়ের। আবার এই চেতনা সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিক সুসম্বন্ধতার (social coherence)। একটি জনগোষ্ঠীর সকলে অভিন্ন আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ভাষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয় এবং তারা যদি অভিন্ন জীবন-পদ্ধতির অংশীদার হয়, তাহলে তাদের মধ্যে 'আমরা এক সম্প্রদায়ভুক্ত' এই অন্তরঙ্গ বোধের সঞ্চার হয়। কাজেই আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের অপরিহার্য উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয়। একই সঙ্গে এবং একই প্রকারে বসবাস সম্পর্কে সচেতনতার অর্থাৎ সম্প্রদায়গত মনোভাবেরও প্রয়োজন হয়।

সম্প্রদায়গত মনোভাবের আবার তিনটি উপাদান আছে। যেমন প্রথমতঃ ‘আমরা মনোভাব’ (we-feeling) দ্বিতীয়ত ঃ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে মনোভাব (role feeling) তৃতীয়ত ঃ নির্ভরতা মনোভাব (dependency feeling)। ১) একই অঞ্চলে বসবাসের ফলে সদস্যদের মধ্যে ‘আমরাবোধ’, ‘সকলেই আমরা আপনজন’ - এমন বোধ জাগ্রত হয়। ২) সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে এবং প্রত্যেককেই তা পালন করতে হয়। পিতা-মাতা, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, কামার, ছুতোর প্রভৃতি সকল মানুষেরই ভূমিকা নির্দিষ্ট থাকে এবং নিজ নিজ ভূমিকা দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বোধ না থাকলে সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না।

৩) সম্প্রদায়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর নির্ভর করে। কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর নয়, নিজ অস্তিত্বের জন্য তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ প্রকার নির্ভরতাবোধ যত তীব্র হয় সম্প্রদায়ের সংহতি তত দৃঢ় হয়। গ্রাম-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে সেখানে ডাক্তার, শিক্ষক, শ্রমিক, চাষী কামার, কুমোর, জেলে, নাপিত প্রভৃতি প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর কোন না কোনভাবে নির্ভশীল।

আধুনিককালে মানুষের চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এখন আর সব চাহিদার পূরণ হয় না। তাছাড়া আধুনিক শিল্পায়নের যুগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা কারণে কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকা সম্ভব নয়। বর্তমানে মানুষের অনেক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য তাকে সংঘ-সমিতির সদস্য হতে হয়। যেমন, পরিবারকে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা হলেও বর্তমান সমাজে কোন পরিবারই স্বয়ংম্ভর নয়, নানা প্রয়োজনে পরিবারকে বিভিন্ন সংঘ-সমিতির সাহায্য নিতে হয়। যেমন শিশুর শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, ছেলে-মেয়েদের সংগীত শিক্ষার জন্য সংগীত প্রতিষ্ঠানের, পীড়িতের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রদায় ও সংঘ-সমিতির মধ্যে আর পূর্বের মতো পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। শিশুর কাছে তার পরিবার সম্প্রদায়রূপে গণ্য হলেও বয়স্কদের কাছে তার গ্রাম বা শহর হচ্ছে তার সম্প্রদায়। তাই বর্তমানকালে কোন জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় অথবা সংঘ-সমিতি তা নির্ধারণ করা সহজবোধ্য নয়।

গ্রাম, ছোট শহর, আদিবাসীদের জাতি বা উপজাতিকে নিঃসংকোচে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যায়, কারণ এসবের প্রতিক্ষেত্রে মানুষ তার জীবনের সমগ্র প্রয়োজন সাধন করতে পারে। তবে এমন কতকগুলি জনগোষ্ঠী আছে যাদের নির্দিধায় সম্প্রদায়রূপে বলা যায় না। ম্যাকাইভার ও পেজ এমন কতকগুলি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন যারা সম্প্রদায় ও সংঘ-সমিতির সীমারেখায় অবস্থিত। বা বলা যায় যারা সম্প্রদায় বা সংঘ-সমিতির কোন্‌টির অর্ন্তভুক্ত তা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। যেমন - ১) একটি সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর মঠ অথবা জেলখানা কি সম্প্রদায় অথবা সংঘ-সমিতি ? অনেকের মতে, মঠ অথবা জেলখানা সম্প্রদায়। কারণ সম্প্রদায়ের দুটি ভিত্তি এখানে উপস্থিত থাকে - আঞ্চলিকতা ও সম্প্রদায়গত মনোভাব। মঠ অথবা জেলখানার সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একইভাবে জীবন-যাপন করে এবং ঐ প্রকারে জীবন নির্বাহ থেকে তাদের মধ্যে ‘আমরা সকলে’ মনোভাব অর্থাৎ সম্প্রদায়গত মনোভাব জাগ্রত হয়। কাজেই মঠ বা জেলখানা হল সম্প্রদায়।

কিন্তু অনেকের মতে মঠ বা জেলখানা সম্প্রদায় নয়, কারণ ঐসব ক্ষেত্রে সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একই প্রকারে জীবন যাপন করলেও তার মূলে হচ্ছে কোন কেন্দ্রীয় সংঘ-সমিতির নির্দেশ। কেনীদ্রয় সংঘ-সমিতির নির্দেশে ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছা মতন জীবন-যাপন করতে পারে না। কেন্দ্রীয় নির্দেশে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তারা জীবন অতিবাহিত করে। কাজেই মঠ বা জেলখানা সম্প্রদায় নয়।

ম্যাকাইভার ও পেজ প্রথম যুক্তিটি গ্রহণ করে মঠ বা জেলখানাকে সম্প্রদায় বলেছেন। এঁদের মতে মঠ বা জেলখানার সদস্যরা যখন মঠে অথবা জেলখানায় তাদের সসমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারে তখন তাদের সম্প্রদায় বলে গণ্য করাই উচিত।

২) সমাজের একটি বর্ণ বা জাতি (social caste) যার অর্ন্তগত সদস্যদের সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন বর্ণের বা জাতির কোন নিবিড় সামাজিক সম্বন্ধ থাকে না, তাকে অর্থাৎ সেই বর্ণ বা জাতিকে (যেমন ভারতের ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়) কোন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে না, বিভিন্ন অঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে, যদিও তাদের মধ্যে 'আমরা' বোধটি উপস্থিত থাকে। যেমন ভারতে ব্রাহ্মণ-বর্ণ নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে অবস্থান করে না, বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে। আঞ্চলিক ভিত্তি না থাকার জন্য অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এ প্রকার বর্ণ বা জাতিকে 'সম্প্রদায়' বলার পক্ষপাতী নন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ